শিক্ষার সংজ্ঞা ও সীমা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ*

'শিক্ষা' বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা।

সাধারণের চোখে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো যেন তেন প্রকারেণ স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপাশের একটি সার্টিফিকেট যোগাড় করা। যার টুপিতে এই সার্টিফিকেটরূপ পালকের সংখ্যা যত বেশি, সাধারণের চোখে সে তত বেশি শিক্ষিত। আবার সেই পালকে যদি বিদেশের ছাপ থাকে তো আর কথাই নেই। পালকধারীরা তখন রীতিমতো সাধারণের দর্শনের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণের দোষ নেই কারণ সমাজ তাদের ঐভাবেই ভাবতে শিখিয়েছে, দেখতে শিখিয়েছে। দোষ সমাজের, দোষ শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণার, দোষ প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার, দোষ তাঁদের যাঁরা এই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছেন, প্রচলন করেছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা যে ফল প্রসব করে চলেছে তা নিতান্তই হাস্যকর হয়ে উঠেছে। একজন ব্যক্তি হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী পেয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই সমাজে একজন উচ্চশিক্ষিত ও বিরাট জ্ঞানী মানুষ বলে তিনি স্বীকৃত। কিন্তু দেখা গেল কাণ্ডজ্ঞানের লেশমাত্রও তাঁর নেই, মৌলিক কোন চিন্তা করার সামর্থ্য তাঁর নেই, সংসারের কোন কাজই তাঁর দ্বারা হয় না। সংসারের যে কোন কাজে তিনি চূড়ান্তভাবে 'মিস ফিট'। আবার হয়তো দেখা গেল তিনি অত্যন্ত ভীরু স্বভাবের মানুষ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অপরপক্ষে একজন ব্যক্তি হয়তো মোটেই প্রচলিত অর্থে 'লেখাপড়া' শেখেননি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী তাঁর নেই। কিন্তু সংসারের নানা কাজে তিনি অত্যন্ত দক্ষ, কোন ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি বিচলিত হন না, নিজস্ব চিন্তার অধিকারী, কোন ব্যাপারেই কারো মুখাপেক্ষী নন, সাহসের সঙ্গে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, কোন নীচতাকে প্রশ্রয় দেন না, কোন নীচতার আশ্রয় নেন না। এই ব্যক্তিটি কিন্তু সাধারণের চোখে 'শিক্ষিত' নন, তিনি 'অশিক্ষিত'। বইপড়া বিদ্যা, স্কুল-কলেজী বিদ্যাকেই শিক্ষা মনে করার ফলেই যে সাধারণের এই ধারণার জন্ম হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত মনে পড়ে সেই বিখ্যাত কাহিনী বা কবিতাটির কথা, যেখানে এক 'বিদ্যাবোঝাই' পণ্ডিত এবং এক 'গণ্ডমূর্খ' মাঝির কথোপকথন বর্ণনা করা হয়েছে। পণ্ডিতের প্রশ্নবাণে বিব্রত মাঝি। মাঝি বই পড়েনি, কি, কবে, কেন, কোথায় কিছু জানে না। তাই পণ্ডিত পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মাঝিকে বললেন, এই সমস্ত না জানার জন্য তার জীবনটার বারো আনাই বৃথা। এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠল। নৌকা টলমল। এই বুঝি ডুবে যায়। মাঝি বলল পণ্ডিতকে : "বাবু, আপনি সাঁতার জানেন? সাঁতার জানলে আজ আপনি প্রাণে বাঁচলেও বাঁচতে পারেন।" পণ্ডিতের জারিজুরি, বাগাড়ম্বর সব মিলিয়ে গিয়েছে তখন। মাঝির পায়ে ধরে তখন তিনি বলছেন : "আমি সাঁতার জানি না, তুই আমাকে বাঁচা।" মাঝি বলল : "আপনি দুনিয়ার সব জানেন, 'কি কবে, কেন, কোথায়' সব আপনার ঠোঁটস্থ। কিন্তু এক সাঁতার না জানার জন্য আপনার জীবনটাই যে এখন যেতে বসেছে। সাঁতার না জানায় আপনার জীবন এখন ষোল আনাই বৃথা।" সুপরিচিত কাহিনীটি শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে শোনা গিয়েছে, সুকুমার রায়ের 'জীবনের হিসাব' কবিতায় বিধৃত হয়েছে। শোনা যায়, এটি নাকি সত্য ঘটনাই।

এই পরিপ্রেক্ষিতটি মাথায় রেখে আমরা এখন 'শিক্ষার সংজ্ঞা ও সীমা' বিষয়টি আলোচনা করব। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন : "যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে-শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।" অর্থাৎ 'শিক্ষা' বলতে স্বামীজী বলতে চাইছেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ। শিক্ষালাভের পর যদি কেউ জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হতে না পারে, যদি তার স্বকীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ না হয় তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষা তার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ শিক্ষা তার মধ্যে সাহস জাগাতে পারেনি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বলেছেন : "নিউ ইয়র্কে দেখতাম, আইরিশ কলোনিস্টস আসছে। ইংরেজপদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ-সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি। তার চলন সভয়, চাহনি সভয়। ছমাস পরে আর এক দৃশ্য-সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে, তার চাহনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নেই। কেন এমন হলো? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ অ্যাইরিশম্যানকে তার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল-সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, 'প্যাট তোর আশা নেই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন্ম শুনতে শুনতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট হিপনোটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ। তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামা মাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল-'প্যাট তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষই তো সব করছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।' প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'।"

শিক্ষার মূল কথা হলো ঐ শক্তির উদ্বোধন ঘটানো। প্রত্যেকের মধ্যেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে। যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির দ্বারা ঐ শক্তির জাগরণ ঘটে, তারই নাম 'শিক্ষা'। স্বামীজী যখন শিক্ষার সংজ্ঞা দিলেন, তখন তিনি ঐ কথাই বললেন। বললেন : "মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব (perfection) সহজাত, তারই বিকাশসাধনকে বলে শিক্ষা। শিক্ষকের কর্তব্য কেবল পথ থেকে বাধাবিঘ্নগুলো সরিয়ে দেওয়া।"

'শিক্ষা' মানে অনেক তথ্য জানা নয়। যে অনেক ডিগ্রী পেয়েছে, বহু বিষয়ে প্রচুর তথ্য যে জেনেছে, একটা অভিধান বা একটা লাইব্রেরীর যত বই আছে সমস্তই যদি কণ্ঠস্থ করে ফেলে থাকে, তবু তাকে যথার্থ শিক্ষিত বলা চলে না। তাকেই শিক্ষিত বলা যায় যে কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে, বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, অনেক জানার সঙ্গে সঙ্গে 'হওয়া'র দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। শুধু জানা নয়, সেই সঙ্গে হওয়া। শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, সেই সঙ্গে আত্মীকরণ বা 'অ্যাসিমিলেশন'। অনেক মহৎ আদর্শ বা চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হলাম, কিন্তু নিজের জীবনে সেগুলির কোন প্রতিফলন ঘটালাম না, তাহলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ হয়ে গেল। একথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। তাঁর সুপরিচিত 'তোতাকাহিনী' গল্পটিতে খুব জোরালোভাবে বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। একই কথা বলেছেন গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ। শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন শিক্ষার্থী হবে গ্রন্থের মর্মবেত্তা–গ্রন্থের শব্দবেত্তা নয়। গ্রন্থ যেন তার জীবনে 'গ্রন্থি' হয়ে না যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : "পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে শোনা আর কাশীদর্শন অনেক তফাত।" অর্থাৎ গুরুত্ব দেওয়া হলো তথ্য সংগ্রহের চেয়ে উপলব্ধির ওপর, তত্ত্বের বৌদ্ধিক ধারণার চেয়ে আত্মিক অনুভূতির ওপর। স্বামীজী বলছেন : "বিভিন্ন চিন্তারাশিকে এমনভাবে নিজের করে নিতে হবে, যাতে আমাদের জীবন এবং চরিত্র গড়ে ওঠে, মানুষ তৈরী হয়। যদি কেউ পাঁচটা ভাব হজম করে জীবন ও চরিত্র ঐভাবে তৈরি করতে পারে, তবে যে মানুষটি একটি গোটা লাইব্রেরী মুখস্থ করে বসেছে, তার চেয়েও সে বেশি শিক্ষিত।" বিদ্রূপ করে স্বামীজী বলেছেন : "শিক্ষা বলতে যদি তথ্য সংগ্রহ বোঝায় তবে তো লাইব্রেরীগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিশ্বকোষগুলি এক একজন ঋষি।" জানার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীকরণ বা 'অ্যাসিমিলেশন' হয় না বলেই এত স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় করেও দেশের বাঞ্ছিত উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। একজন ছাত্র হয়তো পদার্থবিদ্যায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী পেয়েছে, বিদ্যুৎ অথবা আলোক সম্পর্কে গবেষণায় 'পিএইচ. ডি' হয়েছে, কিন্তু বাড়ির 'ফিউজ' উড়ে গেলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া মেকানিককে ডেকে নিয়ে আসে। একজন বলেছিলেন পৌরবিজ্ঞানের একটি ভালো ছাত্রের কথা। ছাত্রটি পৌরবিজ্ঞানের পরীক্ষায় শতকরা নব্বই নম্বর পেয়েছে। কিন্তু দেখা গেল সে রাস্তায় হাঁটার সময়ে কলা খেয়ে কলার খোসাটি রাস্তাতেই ফেলে দিল। পৌরবিজ্ঞানের গোড়াতে সে পৌরনীতি বা সুনাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে যা পড়েছে বা শুনেছে বা জেনেছে বা শিখেছে তা তার ঐ শোনা, পড়া বা বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল, জীবনে, আচরণে তার কোন প্রভাব ফেলতে পারল না। সেকারণে স্বামীজী বলছেন : শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা মানুষের স্নায়ুতন্ত্রীতে মিশে থাকবে। "Education is the nervous association of certain ideas." যেমন দেখা গিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে। তিনি শিখেছেন, অর্থ অনিত্য, অর্থ অহঙ্কারের জন্ম দেয়। অতএব অর্থ বর্জনীয়। দেখা গিয়েছে মুদ্রার সঙ্গে তাঁর শরীরের স্পর্শ ঘটলে তাঁর শরীর সঙ্কুচিত হয়ে যেত। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে অজ্ঞাতসারেও যদি তাঁর মুদ্রাস্পর্শ ঘটত, তাহলেও তাঁর শরীরে বৈকল্য ঘটত। একেই বলে শিক্ষা যা স্নায়ুতন্ত্রীকে পর্যন্ত সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করবে।

স্বামীজী বলছেন : শিক্ষার দ্বারা মানুষ কখনোই 'শেখে' না, মানুষ জ্ঞান 'অর্জন' করে না। 'শেখা' বা 'অর্জন' করা বলতে কি বোঝায়?–আমি জানতাম না, এখন শিখলাম বা জানলাম আমার জ্ঞান ছিল না, আমি জ্ঞান অর্জন করলাম। কিন্তু শিক্ষার প্রশ্নে শেখা, জানা বা অর্জন করার প্রশ্নটিই অবান্তর। কারণ 'শিক্ষা'রূপ প্রক্রিয়ায় মানুষ শুধু 'আবিষ্কার' করে ('discovers') বা 'আবরণ উন্মোচন করে' ('unveils')। স্বামীজী বলছেন, জ্ঞান মানুষের সহজাত। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো জ্ঞান নিয়েই মানুষ জন্মায়। জ্ঞান বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয় না। আমরা বলি নিউটন মাধ্যাকর্ষণ 'আবিষ্কার' করেছেন। এর অর্থ কি এই যে, মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব কোথাও নিউটনের জন্য অপেক্ষা করছিল? না, মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান নিউটনের মনেই ছিল। সময় এল, আর তিনি তা 'আবিষ্কার' করলেন। মানুষ যতরকম জ্ঞানলাভ করছে, সবই ঐ মনের মধ্যে পূর্ব থেকেই নিহিত। 'শিক্ষা' বা 'জ্ঞান' হলো মনের মধ্যে নিহিত ঐ 'শিক্ষা' বা 'জ্ঞান'–এর বিকাশ ঘটানোর ব্যাপার বা ঐ অন্তরে নিহিত জ্ঞানের উপর স্থাপিত আবরণ উন্মোচনের ব্যাপার। যখন সেই জ্ঞানের ক্রমশঃ বিকাশ হয় বা আবরণ ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন আমরা বলি, 'আমরা শিক্ষা করছি' এবং এই প্রক্রিয়া যতই এগিয়ে চলে, শিক্ষা বা জ্ঞান ততই অগ্রসর হয়। এই আবরণ যার যত বেশি সরছে, তুলনামূলকভাবে সে তত বেশি জ্ঞানী। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা বা জ্ঞানের কোন শেষ নেই, সীমা নেই, কোন বয়সও নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" পরিণত বয়সে নিউটন বলতেন : "আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসে নুড়ি কুড়োচ্ছি।" দার্শনিক সক্রেটিস বলতেন : "আমি শুধু এইমাত্র জানি যে, আমি কিছুই জানি না।"

শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব দিতেন মননশীলতা অনুশীলনের উপর, মৌলিক চিন্তা করার ক্ষমতার উপর। অনেক জানা হল, কিন্তু নিজস্ব কোন চিন্তাশক্তি গড়ে উঠল না। সে–জানা তো অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ 'তোতাকাহিনী' গল্পে জিনিসটি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এধরনের শিক্ষাই আমরা পাচ্ছি। ফলে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ নেতিবাচক শিক্ষা হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী তাই দুঃখ করে বলছেন : "এই নেতিবাচক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত থাকার জন্য ভারতবর্ষে বিগত পঞ্চাশ বছরে মৌলিক চিন্তাযুক্ত একটা লোকও জন্মাল না।" বস্তুত, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যদি মৌলিকতার বিকাশ না ঘটে তাহলে শিক্ষা কখনো সার্থক হতে পারে না। গ্রন্থপাঠ করে, প্রবন্ধ লিখে, বক্তৃতা করে আমার অধীত জ্ঞানের বা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটাতে পারি, কিন্তু তাতে আমার সত্যিকারের শিক্ষালাভ হয়েছে একথা বলা যাবে না। যদি অধীত শিক্ষা আমার কথায় ও আচরণে প্রতিফলিত না হয়, পরিস্ফুট না হয় তাহলে সেই শিক্ষার তাৎপর্য কি থাকল? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মন–মুখ এক না হলে কিসের মানুষ? আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করার পর যদি

আমার চিন্তা এবং আচরণে, কথা এবং ব্যবহারে বৈপরীত্য বা দ্বিচারিতা থাকে তাহলে সেই শিক্ষায় কি ফল? সেই বৈপরীত্য বা দ্বিচারিতাকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা যায়–"ভাবের ঘরে চুরি।" স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শিক্ষার সার্থক বিকাশ লক্ষ্য করে বলেছিলেন : "When I think of that man, I feel like a fool, because I want to read books and he never did. ...he was his own book।"

শিক্ষা সার্থক হয় তখনই যখন শিক্ষার ফলে মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। স্বামীজী বলছেন : "মানুষকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও যথেষ্ট হবে না।" বাস্তবিক আমরা আজ সারা দেশে দেখছি লক্ষ লক্ষ বেকার। হতাশার গভীরে তারা নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। স্বামীজী বলছেন, শিক্ষালাভ করার পর যদি কেউ বেকার থাকে, নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে তার শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণ কি? স্বামীজী বলছেন, পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কায়িক পরিশ্রমকে অবহেলা করছি, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে গুরুত্ব দিইনি। স্বামীজী সুসমঞ্জস বা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার কথা বলতেন। বলতেন 'থ্রি এইচ ফরমুলা'র—হ্যান্ড (হাত), হেড (মস্তিষ্ক) এবং হার্ট (হৃদয়)–এর 'ব্যালান্সড গ্রোথ'–এর কথা। তিনি বলতেন শিক্ষা এমন হবে যা মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও কর্মশক্তির বিকাশ ঘটাবে। সুতরাং শিক্ষা হলো 'থ্রি এইচ ফরমুলা'র–হেড, হার্ট অ্যান্ড হ্যান্ড–এর সুষম বিকাশ। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের বুদ্ধি, মন ও শরীরের উৎকর্ষসাধন করবে। এর কোনটিকেই অবহেলা করা চলবে না। স্বামীজী বলতেন : "আমি এমন মানুষ চাই যার মাংসপেশী লৌহদৃঢ়, স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত আর মন বজ্রের উপাদানে গঠিত। আবার হৃদয় পরদুঃখে কাতর।"

স্বামীজীর দৃষ্টি শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি জানতেন গোটা জাতটাকে যদি শিক্ষার আলো না দেওয়া যায়, তাহলে দেশের যথার্থ উন্নতি হবে না। তিনি তাই চাইতেন গণশিক্ষা। তিনি বলেছেন : "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নতি করাই জাতীয় জীবনের পন্থা।" বলেছেন : "আমাদের সমস্ত ত্রুটির মূল এইখানে যে, সত্যিকার জাতি–যারা কুঁড়ে ঘরে দিন কাটায়, তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে। তাদের এই ধারণা জন্মে গেছে যে ধনীর পায়ের তলায় নিষ্পেষিত হওয়ার জন্যই তাদের জন্ম। তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।" তিনি বলতেন, গরীব মানুষেরা তারা বরং মাঠে কাজ করবে, কিন্তু স্কুলে আসতে চাইবে না। মাঠে কাজ করলে তারা গ্রাসাচ্ছাদনের রসদ সংগ্রহ করতে পারবে, কিন্তু স্কুলে এলে তা পারবে না। স্বামীজী তাই বলতেন, শিক্ষাকেই তখন যেতে হবে চাষীর ঘরে। তিনি তাই চাইতেন ভ্রাম্যমান শিক্ষক, যাঁরা গ্লোব, ম্যাপ, ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতি নিয়ে সন্ধ্যাবেলা চাষীদের এক জায়গায় জুটিয়ে তাদের ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতির মূল কথাগুলি সহজ ভাষায় তাদের সামনে তুলে ধরবেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা যে যে বৃত্তিতে আছে, তাকেই কিভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আরো কার্যকরী করা যায়, তাও শেখাবেন। প্রয়োজন হলে তাদের এক–একজনের জন্য একাধিক শিক্ষককে সময় দিতে হবে। স্বামীজী বলছেন, একজন ব্রাহ্মণের ছেলের যদি একজন শিক্ষকের দরকার হয়, তাহলে একজন চণ্ডালের ছেলের জন্য দরকার দশজন শিক্ষকের। তাঁর এই পরিকল্পনাকে কিভাবে রূপদান করা সম্ভব? স্বামীজী বলছেন, দরকার একদল নিঃস্বার্থ ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীকল্প মানুষ, যাঁরা এগিয়ে এসে এই মহান ব্রতটি সম্পন্ন করবেন।

স্বামীজী গণশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছেন স্ত্রীশিক্ষার কথাও। শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে। তার সঙ্গে রান্না, সেলাই, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও তাদের জানতে হবে। আবার জানতে হবে আত্মরক্ষা বা মর্যাদারক্ষার কৌশলও। তেজস্বিতার শিক্ষা, বীর্যের শিক্ষাও তাদের দরকার। সেজন্য তিনি বলতেন, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী বাঈয়ের আদর্শ মেয়েদের সামনে তুলে ধরতে হবে। সেই সঙ্গে চাই পবিত্রতা, সংযম ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার শিক্ষা। সেজন্য স্বামীজী বলতেন সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর আদর্শের কথা। মানুষের শিক্ষার সূচনা বাড়িতে–মায়ের কাছে। সেজন্য মায়েদের প্রয়োজন তেজস্বিতা, বীর্য, মর্যাদারক্ষা, পবিত্রতা, সংগ্রাম ও দৃঢ়তার শিক্ষার আদর্শে নিজেদের আগে থেকে তৈরি করা। মায়েরাই জাতির প্রথম নির্মাতা। সুতরাং শিক্ষার সংজ্ঞা ও সীমার আলোচনায় এই বিষয়টি থাকা অপরিহার্য।

শিক্ষার বাহন কি হবে? স্বামীজী বলছেন : মাতৃভাষা এবং সেই ভাষার রূপ হবে চলিত।

কিন্তু সবকিছুর মূলে থাকবে চরিত্র গঠনের উপর জোর। চরিত্রগঠন অর্থাৎ মানুষ তৈরি হওয়া। স্বামীজীর ভাষায়, "Man-making, character-building education"। একাগ্রতা, ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন আমাদের মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করতে সাহায্য করে। মনের শক্তিগুলি একমুখী না হলে মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা সম্ভব নয়। মন যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে চরিত্রগঠন হওয়া অসম্ভব। চরিত্রগঠনের মূল হলো এমন শিক্ষা যা মনুষ্যত্ব জাগিয়ে দেয়, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করায়, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায়, মানুষকে 'মান হুঁশ' করায়। তা না হলে অগণিত অযোগ্য 'শিক্ষিত' মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, 'শিক্ষিত' বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। মানুষের মনে হতাশা বাড়ে, জীবন জটিল হয়, সমাজে বিশৃঙ্খলা আসে, নৈরাজ্য আসে। এ–অভিজ্ঞতা এখন কম–বেশি আমাদের সকলের। স্বামীজী জানতেন, যদি যথার্থ মানুষ তৈরি না হয় তাহলে কোন উন্নতিই ফলপ্রসূ হয় না। একটা জাত, একটা দেশ এগিয়ে যায় সেই জাতের, সেই দেশের মানুষের শক্তিতে, মানুষের গুণে। 'মানব–সম্পদ'–এর গুণে। সব উন্নতি তখনই সার্থক হয়, যখন ঐহিক উন্নতির সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষের মানসিক উন্নতি, নৈতিক উন্নতি, আত্মিক উন্নতি। স্বামীজী সেকথা বলে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।